

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

ঈদুল ফিতর উদযাপনকালে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

ঈদুল ফিতরের আগে-পরে ১৫ দিনে (৪ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল-২০২৪) দেশে ৩৫৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৬৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৫০০ জনের বেশি। (যদিও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংখ্যা ৪৯৩ জন। শুধু ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালেই (পঙ্গু হাসপাতালে) ঈদের তিন দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ভর্তি হয়েছেন ৪৫৪ জন, যার অধিকাংশই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আক্রান্ত। এই বাস্তবতায় ১৫ দিনে সারা দেশের হাসপাতালসমূহে আহত মানুষের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি হবে।) নিহতের মধ্যে নারী ৬৩, শিশু ৭৪। ১৮৩টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ১৫৬ জন, যা মোট নিহতের ৪২.৫০ শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৫১.১১ শতাংশ। দুর্ঘটনায় ৬৮ জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের ১৮.৫২ শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন ৪১ জন, অর্থাৎ ১১.১৭ শতাংশ।

এই সময়ে ৩টি নৌ-দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৮ আহত হয়েছেন। ১৪টি রেলপথ দুর্ঘটনায় ১৯ জন নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯টি জাতীয় দৈনিক, ৭টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্র:

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী ১৫৬ জন (৪২.৫০%), বাস যাত্রী ১৮ জন (৪.৯০%), ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান-ট্রাক্টর আরোহী ২৬ জন (৭.০৮%), প্রাইভেটকার-মাইক্রোবাস-পাজেরো জীপ আরোহী ২৮ জন (৭.৬২%), থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান) ৫৮ জন (১৫.৮০%), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-মাহিন্দ্র) ৯ জন (২.৪৫%) এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা আরোহী ৪ জন (১.০৮%) নিহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরন:

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে ১২৯টি (৩৬.০৩%) জাতীয় মহাসড়কে, ১৪৩টি (৩৯.৯৪%) আঞ্চলিক সড়কে, ৪৮টি (১৩.৪০%) গ্রামীণ সড়কে এবং ৩৮টি (১০.৬১%) শহরের সড়কে সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরন:

দুর্ঘটনাসমূহের ৯৩টি (২৫.৯৭%) মুখোমুখি সংঘর্ষ, ১৩৮টি (৩৮.৫৪%) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, ৭২টি (২০.১১%) পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, ৪১টি (১১.৪৫%) যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং ১৪টি (৩.৯১%) অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহন:

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি-রেডিমিক্স গাড়ি ১৮.৫৬%, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-পাজেরো জীপ ৬.২৪%, যাত্রীবাহী বাস ১২.৪৮%, মোটরসাইকেল ৩২.৫৭%, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-মিশুক-লেগুনা) ২০.৩৯%, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-পাওয়ারটিলার) ৫.৩২%, বাইসাইকেল-রিকশা ২.৫৮% এবং অজ্ঞাত যানবাহন ১.৮২%।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা:

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা ৬৫৭টি। (বাস ৮২, ট্রাক ৫৯, কাভার্ডভ্যান ১১, পিকআপ ২৮, ট্রলি ১০, লরি ৭, ট্রাক্টর ৬, রেডিমিক্স গাড়ি ১, মাইক্রোবাস ১৩, প্রাইভেটকার ২৪, অ্যান্ডুলেস ৩, পাজেরো জীপ ১, মোটরসাইকেল ২১৪, থ্রি-হুইলার ১৩৪ (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-মিশুক-লেগুনা), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন ৩৫ (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-পাওয়ারটিলার), বাইসাইকেল-রিকশা ১৭ এবং অজ্ঞাত যানবাহন ১২টি।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণ:

সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে ৩.৬৩%, সকালে ২২.৯০%, দুপুরে ১৭.৮৭%, বিকালে ১৯%, সন্ধ্যায় ১০.৮৯% এবং রাতে ২৫.৬৯%।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান:

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা ২৯.০৫%, প্রাণহানি ৩০.৭৯%, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা ১৩.৪০%, প্রাণহানি ১১.৭১%, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা ১৪.৫২%, প্রাণহানি ১২.৮০%, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা ১০.৩৩%, প্রাণহানি ৯%, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা ১০.০৫%, প্রাণহানি ১২.২৬%, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা ৬.৪২%, প্রাণহানি ৬%, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা ৬.৭০%, প্রাণহানি ৭.৩৫% এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা ৯.৪৯%, প্রাণহানি ১০.০৮% ঘটেছে।

ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। ১০৪টি দুর্ঘটনায় ১১৩ জন নিহত। সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম ২৩টি দুর্ঘটনায় ২২ জন নিহত। একক জেলা হিসেবে ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বেশি ৩২টি দুর্ঘটনায় ২৮ জন নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে কম চাঁদপুর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও লালমনিরহাট জেলায়। এই ৪টি জেলায় স্বল্প মাত্রার কিছু দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায়নি।

রাজধানী ঢাকায় ২৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত ও ৫২ জন আহত হয়েছে।

ঈদযাত্রা ও দুর্ঘটনা পর্যালোচনা:

এবারের ঈদুল ফিতরে রাজধানী ঢাকা থেকে কমবেশি ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ ঘরমুখী যাত্রা করেছেন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৪ কোটি মানুষ যাতায়াত করেছেন। ঈদের আগে-পরে যথেষ্ট ছুটি থাকা, দেশের বিভিন্ন সড়কের অবস্থা ভালো থাকা, বৃষ্টিপাত না হওয়া এবং সরকারের কিছুটা তৎপরতার কারণে ঈদযাত্রায় তেমন যানজট হয়নি। তুলনামূলক স্বস্তিদায়ক ছিল।

ঈদযাত্রায় ট্রেনের টিকেট শতভাগ অনলাইন করায় টিকেট কালোবাজারী হয়েছে, ফলে মানুষ ভোগান্তি শিকার হয়েছেন। সড়ক ও নৌ-পথে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হয়েছে। ঈদ যাত্রায় সদরঘাটে ভেড়ানো লঞ্চার রশি ছিড়ে ৫ জন যাত্রী নিহত এবং কয়েকজনের আহতের ঘটনা সদরঘাটের নৈরাজ্য প্রমাণ করে।

এবার ঈদযাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানি উভয়ই বেড়েছে। গত বছরে ঈদুল ফিতরে ২৪০টি দুর্ঘটনায় ২৮৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। প্রতিদিন গড়ে ১৭.১৪টি দুর্ঘটনায় ২০.৩৫ জন নিহত হয়েছিল। এই বছরে ঈদযাত্রায় প্রতিদিন গড়ে ২৩.৮৬টি দুর্ঘটনায় ২৪.৪৬ জন নিহত হয়েছেন। এই হিসাবে এবছর দুর্ঘটনা বেড়েছে ৩৯.২০% এবং প্রাণহানি বেড়েছে ২০.১৯%। এবারের ঈদ উদযাপনকালে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫টি পরিবার পরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেউ বেঁচে নেই! স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিহত হয়েছে ৭৪ জন।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ:

ঈদযাত্রায় ৩৫ থেকে ৪০ লাখ মানুষ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গন্তব্যে যাতায়াত করেছেন। ব্যাপকহারে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং মোটরসাইকেলে একসাথে স্বামী-স্ত্রী নিহতের ঘটনা ঘটেছে ৭টি। মোটরসাইকেল ৪ চাকার যানবাহনের চেয়ে ৩০ গুণ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এটা কোনোভাবেই গণপরিবহনের

বিকল্প হতে পারে না। মূলত মানসম্পন্ন গণপরিবহন সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী না হওয়ার কারণেই মানুষ মোটরসাইকেলে দূরের গন্তব্যে যাতায়াত করছেন।

এবার ঈদ উদযাপনকালে ১৮৩টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৫৬ জন নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের ৪২.৫০ শতাংশ। আহত হয়েছেন হাজারের অধিক। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৫১.১১ শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৫১.৩৬%, মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে ২৩.৪৯% এবং অন্য যানবাহন দ্বারা মোটরসাইকেলে চাপা/ধাক্কা দুর্ঘটনা ঘটেছে ২৫.১৩%।

২০২৩ সালের ঈদুল ফিতরে ১২৩ টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৩৩ জন নিহত হয়েছিল। প্রতিদিন গড়ে ৮.৭৮টি দুর্ঘটনায় ৯.৫ জন নিহত হয়েছিল। এ বছরে প্রতিদিন গড়ে ১২.২টি দুর্ঘটনায় ১০.৪ জন নিহত হয়েছেন। এই হিসাবে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বেড়েছে ৩৮.৯৫% এবং প্রাণহানি বেড়েছে ৯.৪৭%।

কিশোর-যুবকরা বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালিয়ে ব্যাপক মাত্রায় দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছে। মোটরসাইকেলে ৩ জন নিহতের ঘটনা ঘটেছে ১১টি। এরা সবাই কিশোর-যুবক। বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কা ১৮ জন পথচারী নিহত হয়েছেন। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের মধ্যে ৫৩ শতাংশের বয়স ১৪ থেকে ২০ বছর।

এবারের ঈদ যাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ মানব সম্পদের ক্ষতি হয়েছে তার আর্থিক মূল্য ১ হাজার ৩ শত ৩০ কোটি ৫০ লাখ টাকার মতো। যেহেতু সড়ক দুর্ঘটনার অনেক তথ্য অপ্রকাশিত থাকে, সেজন্য এই হিসাবের সাথে আরও ৩০% যোগ করতে হবে। iRAP (International Road Assessment Program) এর method অনুযায়ী হিসাবটি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ যানবাহন বা প্রপার্টি ড্যামেজ হয়েছে তার তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রপার্টি ড্যামেজের আর্থিক পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, গণমাধ্যমে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, প্রকৃত ঘটনা তার চেয়ে অনেক বেশি।

বাস্তবতা হলো, ঈদ উদযাপনকালীন বিপুল সংখ্যক মানুষকে পরিবহন করার মতো মানসম্পন্ন গণপরিবহন আমাদের নেই। ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে যেয়ে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হন। ক্ষেত্রবিশেষ মানুষের অসচেতনতার কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। আসলে একটি সুস্থ ও নিরাপদ ঈদযাত্রা নিশ্চিত করতে হলে কমপক্ষে ৩ বছরের একটি টেকসই পরিবহন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সড়ক অবকাঠামো ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রেল ও নৌপথ সংস্কার ও উন্নয়নসহ নানাবিধ কাজ করার মাধ্যমে পরবর্তী সকল ঈদযাত্রা নিরাপদ হবে। এছাড়া ঈদের ১ মাস, ১৫ দিন বা ৭দিন পূর্বে দফায় দফায় বৈঠক করে খুব বেশি কাজ হবে না, হওয়ার কথাও না। ঈদের আগে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে যেসব দাবি-দাওয়া জানানো হয় সেগুলো শুধু কথা বলার জন্যই বলা। কোনো কাজে আসে না।

ঈদ পরবর্তী সময়ে দুর্ঘটনা বেশি ঘটেছে। এটি প্রতি বছরের চিত্র। কারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রস্তুতি ঈদের পূর্বে যেভাবে থাকে, পরবর্তীতে সেভাবে থাকে না। পুরো পরিকল্পনা সাজানো হয় ঈদপূর্ব যাতায়াতকে বিবেচনায় নিয়ে। এছাড়া আর্থিক সংকটসহ নানা কারণে কর্মশ্রমমুখী মানুষের মধ্যে অস্থিরতা থাকে। ফলে এসময় দুর্ঘটনা বেশি ঘটে।

পেশাগত সুযোগ-সুবিধার অভাবে, বিশেষ করে নিয়োগপত্র, বেতন ও কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকার কারণে বাস এবং পণ্যবাহী যানবাহনের চালকরা মানসিকভাবে অস্থির থাকেন। তাদের মধ্যে জীবনবোধ ঠিক মতো কাজ করে না। পণ্যবাহী যানবাহন চালকদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রকট। তারা সবসময় অস্বাভাবিক আচরণ করেন এবং বেপরোয়াভাবে যানবাহন চালান। ফলে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হন। এই প্রেক্ষাপটে পরিবহন চালকদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত না করলে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

দেশে সড়ক অবকাঠামো বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়কের দৈর্ঘ্য ২২ হাজার ৪৭৬.২৮ কিলোমিটার। গ্রামীণ সড়ক প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার কিলোমিটার। দেশব্যাপী এসব সড়কে নানা প্রকার যানবাহন যেমন বেড়েছে, তেমনি যানবাহনের গতিও বেড়েছে। কিন্তু গতি নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিংয়ের জন্য যথেষ্ট মাত্রায়

প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে গতির প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং দুর্ঘটনা ঘটছে। ৮৫ শতাংশ দুর্ঘটনার প্রধান কারণ যানবাহনের অতিরিক্ত গতি। উল্লেখ্য, যানবাহনের গতি ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটারের উপরে প্রতি ৫ কিলোমিটার বৃদ্ধিতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি ২ থেকে ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। ঈদযাত্রায় ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে ৯টি দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়েছে। সবগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে অতিরিক্ত গতির কারণে। ইদানিং মহাসড়কে বিকল হওয়া পণ্যবাহী যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকছে। এই অবস্থায় বেপরোয়া গতির অপর যানবাহন দাঁড়ানো যানবাহনের পেছনে ধাক্কা দিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে। ঈদযাত্রায় ১৭টি এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। যানবাহনের চাকা ফেটে দুর্ঘটনার সংখ্যাও বাড়ছে। চাকা ফাটার সাথে অতিরিক্ত গতির সম্পর্ক রয়েছে।

দেশের সড়ক অবকাঠামোর ডিজাইনগত ত্রুটির কারণে মহাসড়কে স্বল্পগতির থ্রি-হুইলার চলাচলা যেহেতু বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু মহাসড়কে কিছুদূর অন্তর ফিতা টাঙিয়ে হলেও অস্থায়ীভাবে সার্ভিস রোড করে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ রোড বা ফিডার রোড থেকে মহাসড়কে উঠার ক্ষেত্রে যে রোড ডিজাইন আছে সেটা সংশোধন করতে হবে। ছোট যানবাহন হঠাৎ করে যাতে সরাসরি মহাসড়কে উঠতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

আপনারা সকলেই জানেন যে, সড়ক পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সড়ক পরিবহন আইনের বিভিন্ন বিধি, ধারা-উপধারা ইত্যাদি বিষয়ে সংশোধনের দাবি জানিয়ে আইনটি বাস্তবায়নে আপত্তি জানিয়ে আসছেন। ইতোমধ্যে সরকার জামিন অযোগ্য ধারা জামিনযোগ্য করেছে, জেল-জরিমানার মাত্রা কমিয়েছে। আমরা বিষয়টিকে মেনে নিয়ে আইনটি বাস্তবায়ন শুরু করতে বলেছি। কিন্তু মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলছেন, তাঁদের আরও দাবি আছে। আমাদের বক্তব্য, তাঁদের দাবিসমূহের বিষয়ে প্রকাশ্যে একটি সংলাপ হোক। দাবিগুলো যদি যৌক্তিক হয়ে থাকে, তাহলে সরকার অতি দ্রুত মেনে নিয়ে আইনটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন শুরু করুক। আইন সংশোধন বিষয়ে মালিক-শ্রমিকদের সাথে সরকার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে বছরের পর বছর সময়ক্ষেপণ করবে- এটা হতে পারে না। সড়কে সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, মানুষ পঙ্গু হচ্ছে। এর দায় কি পরিবহন মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দ নিচ্ছেন? সরকার নিচ্ছে? তাছাড়া আইন বাস্তবায়ন হলে তো পরিবহন শ্রমিকদেরই লাভ। তাদের বেতন ও কর্মঘন্টা নিশ্চিত হবে। তারা নিয়োগপত্র পাবেন। তাদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হবে।

সড়ক পরিবহন খাতে প্রকাশ্যে বিভিন্ন নামে ও অজুহাতে চাঁদাবাজি হয়। স্লিপ দিয়ে লাঠি হাতে সারা দেশে এই বেপরোয়া চাঁদাবাজি চলে। পরিবহন শ্রমিক নেতারা বলেন, তারা এসব চাঁদাবাজির সাথে জড়িত নন। তারা শুধুমাত্র শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের জন্য প্রতিদিন যানবাহন প্রতি ৩০ টাকা হারে চাঁদা তোলেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সারা দেশে এই চাঁদাবাজি করছেন কারা? এই চাঁদার ভাগ পাচ্ছেন কারা?

পরিবহন শ্রমিক সংগঠনসমূহ যদি বাস্তবিক উদ্দেশ্যেই শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের জন্য যানবাহন প্রতি ৩০ টাকা হারে চাঁদা সংগ্রহ করে থাকেন, তাহলে তারা এই চাঁদা রাস্তা থেকে বিশৃঙ্খলভাবে না তুলে অফিসভিত্তিক সংগ্রহ করতে পারেন। এতে চাঁদাবাজির অপবাদ থেকে তারা মুক্ত হবেন এবং সড়কেও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও যারা সড়কে চাঁদাবাজি করবেন তারা শ্রমিক নেতাদের কেউ নন বলে চিহ্নিত হবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হবে। মূলত চাঁদাবাজিই সড়ক পরিবহনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধা।

দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ:

১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন;
২. বেপরোয়া গতি;
৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা;
৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা;
৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল;
৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো;
৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা;
৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা;
৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি;
১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহ:

১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; ৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য সার্ভিস রোড তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে; ৮. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৯. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ১০. গণপরিবহন উন্নত, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করে মোটোসাইকেল ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে; ১১. ঈদের আগে-পরে সড়ক, নৌ ও রেলপথে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; ১২. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১৩. “সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮” বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের জীবনে নিত্য আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগের ধারাবাহিকতা নেই। সবকিছু চলছে দায়সারাভাবে। অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে সড়ক পরিবহন খাতের অব্যবস্থাপনার কারণে। এই অবস্থার উন্নয়নে টেকসই সড়ক পরিবহন কৌশল প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)

নির্বাহী পরিচালক

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

প্রয়োজনে: ০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬